উদ্বাস্তু সমস্যা ও নাগরিকত্ব

মোহিত রায়

প্রকাশক : ভারতীয় সংস্কৃতি ট্রাস্ট

প্রকাশকাল : রাস পূর্ণিমা, ২০১৭

মুদ্রক : নিউ ভারতী প্রেস
বিধান সরণী, কল - ৬

সহযোগ রাশি : দশ টাকা মাত্র

উদ্বাস্তু সমস্যা ও নাগরিকত্ব

বাংলাদেশে কি উদ্বাস্তু সমস্যা আছে ?

এই পুস্তিকা শু(করা যাক একটি আশ্চর্য প্র(দিয়ে যা কেউ করেন না। বাংলাদেশে কি উদ্বাস্তু সমস্যা আছে? যদি না থাকে তবে স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা থাকছে কেন? প্র(টো এজন্য করা হলো কারণ আমরা সবাই জানি যে ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। ভারতবর্ষের পূর্ব অংশে ভাগ হলো বাংলা প্রদেশ, ভাগ হয়ে হলো পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান যা এখন বাংলাদেশ। বাংলা ভাগের ফলে অনেক হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন আবার কিছু মুসলমানরা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। এর ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা তৈরি হয়। স্বাধীনতার ৭০ বছরে পরেও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা হয়ে রয়েছে। এখনো বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত হিন্দু উদ্বাস্তুরা আসছেন। তাহলে কি বাংলাদেশেও উদ্বাস্তু সমস্যা রয়েছে? বাংলাদেশেও কি পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিয়মিত মুসলমান উদ্বাস্তুরা যাচ্ছেন যা সেদেশে অনেক সমস্যা তৈরী করেছে? না, বাংলাদেশ কোন উদ্বাস্তু সমস্যা নেই।

পূর্ব পাকিস্তান বদলে বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে ৪৫ বছর, এই ৪৫ বছরে একজন মুসলমান উদ্বাস্তুও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশে যান নি। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে কেন উদ্বাস্তু সমস্যা থেকেই যাচ্ছে? কেন পূর্ব পাকিস্তানের মতন বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা চলে আসছেন? এই বিষয়টির কোন সরাসরি উত্তর পশ্চিমবঙ্গের কোন রাজনৈতিক দল (বিজেপি ছাড়া) দেবে না, কোন সমাজ গবেষণা কেন্দ্র, বি(বিদ্যালয়, বুদ্ধিজীবিরা আলোচনা করবে না, টিভিতে এ নিয়ে কোন আলোচনা হবে না। এক ভয়ংকর নীরবতা এই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। গত সত্তর বছরে এই উপমহাদেশে ইসলামি মৌলবাদ এমন এক সমর্থক পরিবেশ তৈরি করতে স(ম হয়েছে যে আজকে উদ্বাস্তু সমস্যাটিকে সবাই লুকিয়ে রাখতে চান। কারণ এ নিয়ে সংবাদপত্রে টিভিতে আলোচনা হলেই বাংলাদেশে কিভাবে হিন্দুরা ইসলামি অত্যাচারে আত্র(ান্ত হচ্ছেন তা সবাই জেনে যাবেন। এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আমাদের আরো অনেক দিন ভুগতে হতে পারে।

কিভাবে উদ্বাস্তু সমস্যা শু(হলো

ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল মুসলমান জনসাধারণের প্রতিনিধি দল মুসলিম লীগের ভারতবর্ষের মুসলমানপ্রধান অংশগুলিকে নিয়ে আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবীতে। ১৯৪৬ সালের ব্রিটিশ ভারতের নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয় দাবীটিকে আরো শক্তি(শালী করে।

বিভিন্ন কারণে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই দাবী মেনে নেয়। ১৯৪৭ সালে যখন ব্রিটিশ সরকারের আর ভারতে রাজত্ব চালানোর শক্তি(ছিল না তখন তারা ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে স্বাধীনতা প্রদান করেন। ভারতবর্ষের পশ্চিমের মুসলমানপ্রধান সিন্ধু প্রদেশে, বালুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত(হয়। পাঞ্জাব রাজ্যকে দুভাগ করে পশ্চিমের মুসলমানপ্রধান অংশ যায় পাকিস্তানে এবং হিন্দু-শিখ প্রধান অংশ থাকে ভারতে। ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী যুক্ত(বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) মুসলমানরা ছিল ৫৬ % আর হিন্দুরা ছিল ৪৪% । দুটি প(র মধ্যে জনসংখ্যায় তফাৎ খুব বেশি ছিল না। কিন্তু মুসলিম লীগ ও কমুনিষ্ট পার্টি চেয়েছিল পুরো বাংলাই যাক পাকিস্তানে। ফলে বাংলা ভাগ হবে কিনা না কোন দেশে যুক্ত(হবে তা নিয়ে ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন বঙ্গীয় আইনসভায় ভোটাভুটি হয়। সেদিন বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে তৈরী হল পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। বাংলার হিন্দু প্রধান অংশগুলির প্রতিনিধি নিয়ে তৈরি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। এই ভোটে তফসিলি প্রতিনিধিরা সহ সব হিন্দু প্রতিনিধিই বাংলা ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প(ভোট দেন।

এই দেশভাগের সময় অর্থাৎ ১৯৪৭-এর কিছু আগে ও পরে পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের সঙ্গে মুসলমানদের রক্ত((য়ী দাঙ্গা চলে বেশ কিছুদিন। পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ যায় পাকিস্তানের ভাগে, পূর্ব অংশ পড়ে ভারতে। সেখানে দু প(র মানুষেরাই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হতে থাকেন। ফলে দেশভাগের পরেই পাঞ্জাব প্রদেশে জনবিনিময় হয় অর্থাৎ মুসলমানরা পাকিস্তানের পাঞ্জাবে চলে যায়, হিন্দু-শিখরা ভারতের পাঞ্জাবে চলে আসেন। ফলে ভারতের পাঞ্জাবে যেমন মুসলমান প্রায় নেই বললেই চলে তেমনি পাকিস্তানের পাঞ্জাবে হিন্দু-শিখ নেই। বিপুল সংখ্যার সর্বস্বান্ত হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তুরা পাঞ্জাব ও দিল্লি অঞ্চলে বড় সমস্যার কারণ হয়। একই সমস্যা পাকিস্তানেও ঘটে। এটা হল পশ্চিম সীমান্তের উদ্বাস্তু সমস্যা।

বাংলায় হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক কখনোই ভাল ছিল না। দেশভাগের ঠিক আগে ভারত ভেঙে পাকিস্তান গড়বার দাবীতে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে বা প্রত্য(সংগ্রাম দিবসের ডাক দেন। সেই দিন কলকাতা ময়দানে বিশাল জনসভা হয় যাতে ভিড়ের জন্য আমন্ত্রিত হয়েও উপস্থিত থাকতে পারেন নি কমুনিষ্ট নেতা জ্যোতি বসু। এই সভা থেকেই শু(হয় কলকাতা জুড়ে হিন্দুদের উপর নারকীয় আত্র(মণ। এটি করা হয় তখন বাংলার

প্রধানমন্ত্রী (এখানকার মুখ্যমন্ত্রী) মুসলিম লীগ নেতা শহীদ সুরাবর্দীর নেতৃত্বে। দুদিন পর এই আত্র(মণের রূপ পাল্টে যায়, হিন্দু শিখদের প্রতিরোধে পরে তিন দিন মুসলমানরা বেশী (তিগ্রস্ত হন। কয়েক হাজার মানুষ এই দাঙ্গায় নিহত হন যাকে বলা হয় গ্রেট ক্যলকাটা কিলিং। এর বদলা নিতে দু মাস পরে ১৯৪৬-এর পুর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে বেশ কয়েকদিন ধরে চলে হিন্দু গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, ও ধর্মান্তর। এসবের পরেই বাংলা ভাগ করার ব্যাপারটি নিশ্চিত হয় যায়। স্বাধীনতার ঠিক আগে মে মাসেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারকে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে জনবিনিময়ের প্রস্তাব দেন কিন্তু তা গ্রাহ্য হয় নি। ফলে সেসময় জনবিনিময় হলো না।

ঠিক স্বাধীনতার সময়ে বাংলা শান্ত ছিল ফলে জনবিনিময়ের কথাটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু এক বছর না কাটতেই পূর্ব পাকিস্তানে শু(হয়ে গেল ত্র(মাগত হিন্দু নির্যাতন, হিন্দু উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসতে শু(করলেন। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার শু(যা আজও শেষ হবার ল(ণ নেই।

পাঞ্জাব ও বাংলা—একই সময় ভাগ হয়েছিল, পাঞ্জাবে কি এখানো উদ্বাস্তু সমস্যা আছে

না, পাঞ্জাবে কোন উদ্বাস্তু সমস্যা অনেক বছর ধরেই নেই। আগেই বলা হয়েছে যে দুই পাঞ্জাবের মধ্যে বছরখানেকের মধ্যেই এক ধরণের জনবিনিময় সমাপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং নতুন করে আর উদ্বাস্তু আসার কোন ব্যাপার ছিল না। প্রাথমিকভাবে প্রায় ৫০ ল(হিন্দু শিখ উদ্বাস্তু যেমন ভারতে আসনে তেমনি প্রায় সমসংখ্যক মুসলমান ভারতের পাঞ্জাব ছেড়ে চলে যান। সেজন্য সমস্যার চাপটি অনেক কমে যায়। এর পর কয়েক দশকে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সমস্যা মিটে গেছে, বরং এই উদ্বাস্তুদের অনেকেই অনেক উন্নত জীবনযাত্রায় ফিরতে পেরেছেন। ভারতের বিগত প্রধানমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিং ছিলেন এরকম একজন সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তু।

তাহলে বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা কোনদিনই মিটলো না কেন

এই প্র(ের উত্তর অনেকটা বড়ো হবে। প্রথম আমরা জানবো কেন বা বিশেষতঃ কার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে এই ভয়ংকর উদ্বাস্তু সমস্যা আজও বইতে হচ্ছে। এরপর উদ্বাস্তু সমস্যার দুটি ভাগ এক, পূর্ব পাকিস্তানের সময় ও দুই বাংলাদেশের সময়ের কথা আলোচনা করব। আলোচনা করব হিন্দু উদ্বাস্তুদের শত্রুদের ও অনুপ্রবেশ নিয়েও।

উদ্বাস্তু সমস্যার জন্য দায়ী নেহে(

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী

জওহরলাল নেহে(। ১৯৪৬-র নোয়াখালী গণহত্যার পর থেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা চলে আসতে শু(করেন। এঁদের অনেকেই যান ত্রিপুরায়। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে ধীরে ধীরে হিন্দুরা চলে আসতে থাকেন। ১৯৪৮-এর মাঝামাঝি ১০ ল(হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। সবসময় দাঙ্গা নয়, মন্দির অপবিত্র করা, প্রকাশ্য স্থানে অপমান করা ও হিন্দু নারীদের (ীলতাহানি করা ও এইসব অপরাধে প্রশাসনের সম্পূর্ণ অসহযোগিতা হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছিল। কোন একটা ঘটনার ছুতোয় আত্র(মণ হতে থাকলো হিন্দুদের উপর। ১৯৪৯ সালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাদের নিজামের রাজাকার বাহিনীকে হটিয়ে হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি(র পর পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুরা আত্র(ান্ত হয়। এরপর ১৯৫০-এর শু(থেকে সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে শু(হয় হিন্দুদের উপর আত্র(মণ, গণহত্যা, নারী ধর্ষণ। ল(ল(হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। এই আত্র(মণের শিকার ছিলেন সব ধরণের হিন্দুরা। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহে(এসে উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলি পরিদর্শন করে উদ্বাস্তুদের নিদা(ণ অবস্থা স্বচ(দেখে যান, শুনে যান কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলছে। এই সময় দিল্লিতে সংসদে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ল(ীকান্ত মৈত্র জনবিনিময়ের দাবী তোলেন, দাবী তোলেন অন্য প্রদেশের প্রখ্যাত নেতারা। এই দাবীর প(ছিলেন ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর। বি.আর.আম্বেদকার দেশভাগের অনেক আগে ১৯৪০ সালেই সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেছিলেন যে সংখ্যলঘু বিনিময়ই নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বাধীনতার ঠিক আগেই, ২মে ১৯৪৭-এ একটি চিঠি লিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বলেন যে যেহেতু বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানরা দুটি প্রান্তে বেশি সংখ্যায় থাকেন ফলে হিন্দু ও মুসলমান জনবিনিময় সমস্যা হবে না।

কিন্তু নেহে(ভারতের ধর্মীয় সহাবস্থানের মহান ঐতিহ্যের ধুয়ো তুলে এসবকে ‘ননসেন্স’ বলে অগ্রাহ্য করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ভবিষ্যত ধ্বংস করতে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি চুক্তি(করেন। তাঁর আমন্ত্রণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত খান ভারতে আসনে ও নেহে(-লিয়াকত চুক্তি(স্বা(রিত হয়। এতে বলা হয় যে পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দুরা এবং ভারতে থেকে যাওয়া মুসলমানরা আবার নিজের নিজের দেশে ফিরে যাবেন এবং তাঁদের সুর(া ও সম্পত্তির দায়িত্ব সে দেশের সরকার নেবেন। এক কথায় উদ্বাস্তু হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাবেন এবং তাঁদের সুর(া দেবে ও তাঁদের লুণ্ঠিত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে ইসলামি পাকিস্তানি সরকার। এরকম একটি ভণ্ডামি জওহরলাল নেহ(-র প(ই করা সম্ভব। এর আগেই তিনি দেশের

স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কাশ্মীরে বিজয়ী ভারতীয় সৈন্যদের অভিযান থামিয়ে কাশ্মীরের একটি বড় অংশ পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ আমেরিকানদের প্রাধান্যের সংস্থান রাষ্ট্রসংঘে গিয়ে ভারতের অবস্থানকে আরো দুর্বল করেছেন। সুতরাং জওহরলাল যে ইসলামি পাকিস্তানের উপর পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মান-সম্মান নিরাপত্তার ভার ছেড়ে দিতে চাইবেন তা আর আশ্চর্য কি। এই চুক্তি(র বি(দ্ধে পশ্চিমবঙ্গের দুইজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা কে সি নিয়োগী-নেহে(র মন্ত্রী সভায় থেকে পদত্যাগ করলেন। শ্যামাপ্রসাদ এই চুক্তি(র বি(দ্ধে সংসদে বললেন-'ব্যাপক সংখ্যায় হিন্দুরা আসতে থাকবেন, আর যাঁরা আসবেন তাঁরা ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না। অন্যদিকে যে সমস্ত মুসলমান চলে গিয়েছিল তারা ফিরে আসবেন এবং আমাদের দৃঢ় বি(্বাস চুক্তি(টির এক তরফা রূপায়ণে মুসলমানেরা ভারত ছেড়ে যাবে না। আমাদের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং আমাদের দেশের মধ্যেকার সংঘাত আরও বেড়ে যাবে'। এভাবেই উদ্বাস্তু সমস্যা স্থায়ী হলো।

পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর আত্র(মণ ও উদ্বাস্তু স্রোত

ফলে ব্যাপারটি এরকম দাঁড়াল যে ইসলামী অত্যাচারে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে আসতে থাকলেন তাঁদের কোনোরকম সুর(া পাকিস্তান দিতে পারে নি বা দিতে চায়নি বরং দেশভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশ কয়েক ল(মুসলমান পুর্বপাকিস্তানে চলে গেছিলেন, নেহে(র চুক্তি(বলে এঁদের সত্তর শতাংশ আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এলেন। যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে থেকে গেলেন তাঁরা মূলত শি(িত বাঙালী মুসলমান, যাঁদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে ছিল শি(িত হিন্দুদের অভাবে চাকরী ও ভিন্ন পেশার জন্য সহজ সুযোগ। এই একমুখী হিন্দু উদ্বাস্তু আগমণ যেমন পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে চাপাল বিরাট অর্থনৈতিক বোঝা অন্যদিকে মুসলমানদেরও পশ্চিবঙ্গে ফিরে আসায় পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকল।

১৯৫০-এর হিন্দুদের উপর গণআত্র(মণে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের ঢল নামাল। ১৯৫১-এর জনগণনায় দেখা যায় ৩৫ ল(র বেশি হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে এসে গেছেন যা তখনকার জনসংখ্যার ১০ শতাংশ। এই আত্র(মণে হিন্দুদের সব সম্প্রদায় (তিগ্রস্থ হয়। স্বাধীনতার আগে তপশিলি সম্প্রদায়ের একজন অন্যতম নেতা ছিলেন বরিশালের শ্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যিনি তপশিলি জাতি ও মুসলমান ঐক্যে বি(্বাসী ও প্রচারক ছিলেন। এর জন্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যুক্ত(বাংলার মুসলিম লিগ সরকারে মন্ত্রী ছিলেন,

দেশ ভাগের পর তাঁকে সসম্মানে পাকিস্তানের মন্ত্রী সভায় স্থান দেওয়া হয়। পাকিস্তানের লিয়াকত আলি খান সরকারের আইন ও শ্রম মন্ত্রী হন যোগেন্দ্র মণ্ডল। কিন্তু তপশিলি হিন্দু ও মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের গপ্পোটা একেবারেই খান খান হয়ে যায় ১৯৫০-এর আত্র(মণে। যোগেন্দ্রবাবুর বরিশালেই তফশিলি সম্প্রদায়ের উপর চলে ভীষণ আত্র(মণ। এসব দেখে মন্ত্রীমশাইকে পাকিস্তান গঠনের তিন বছরের মধ্যে কল্পিত স্বর্গরাজ্য ছেড়ে 'ব্রাহ্মণ্যবাদী' হিন্দুস্তানে পালাতে হয়। ভারতে পালিয়ে এসে ১৯৫০ সালের ৮ অক্টোবর, পাকিস্তান মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন, হিন্দুস্তানে থেকেই তিনি পদত্যাগ পত্র পাঠান। যাঁরা এখনও দলিল-মুসলিম ঐক্যর ধ্বজাধারী তাঁদের জন্য তাঁর পতদ্যাগ পত্রের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন। শ্রী মণ্ডল লেখেন-'আমার প(এটা বলা অন্যায় নয় যে পাকিস্তানে বসবসকারী হিন্দুদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে 'নিজ ভূমে পরবাসী' করা হয়েছে, আর এটাই এখন হিন্দুদের কাছে পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। হিন্দু ধর্মে বি(্বাস করাটাই এদের একমাত্র অপরাধ।' যোগেন্দ্রনাথ অন্ধকার ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ দিলেন-'সুদীর্ঘ ও উদ্বেগময় সংগ্রামের পর শেষ পর্যন্ত আমাকে একথাই বলতে হচ্ছে যে পাকিস্তান আর হিন্দুদের বাসযোগ্য নয়। তাদের ভবিষ্যতে প্রাণনাশ ও ধর্মান্তরণের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে। অধিকাংশ উচ্চ বর্ণের হিন্দু ও রাজনৈতিক সচেতন তফশিলি জাতির লোকেরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে গেছে। যে সমস্ত হিন্দুরা এই অভিশপ্ত দেশে অর্থাৎ পাকিস্তানে থেকে যাবে, আমার দৃঢ় বি(্বাস ধীরে ধীরে এবং সুপরিকল্পিত ভাবে তাদের মুসলমানে পরিণত করা হবে বা নিশ্চিহ্(করা হবে।' যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ পত্র অনুয়ায়ী শুধু বরিশাল জেলায় হিন্দু মৃতের সংখ্যা ২৫০০ এবং গোটা পূর্ব পাকিস্তানে অন্তত ১০ হাজার।

পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর আত্র(মণ, নারী নির্যাতন, জোর করে সম্পত্তি দখল রোজকারের ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। ফলে হিন্দু উদ্বাস্তু আসা বেশি-কম চলতে থাকল। ১৯৬৪ সালের শু(তে সুদূর কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ থেকে নবী হজরত মহম্মদের চুল চুরি যায় যার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের কোন যোগ নেই। অথচ এই হুজুগে সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে চলল হিন্দুদের উপর আত্র(মণ। আবার এক সঙ্গে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ভারতে চলে এলেন। এরপরেই পাশ হয় ইষ্টবেঙ্গল ইভাকুইজ প্রপার্টি আইন যার ফলে উদ্বাস্তুদের ফেলে আসা সম্পত্তির দখল নিতে থাকল পাকিস্তান সরকার। এর পর ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে এল শত্রু সম্পত্তি আইন যা ভারতে চলে আসা হিন্দুদের জমি-সম্পত্তির আইনি উত্তরাধিকারীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল সরকার। এই ভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের সরকার হিন্দু সমাজকে অর্থনৈতিক

ভাবে নিঃস্ব করে দিল। যখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুরা দলে দলে চলে আসছেন তখন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা কিন্তু বহাল তবিয়তে রয়ে গেছেন এখানেই।

এই প্রায় কোটি খানেক উদ্বাস্তুর ভার পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে (তিগ্রস্ত করলো। যেহেতু পাঞ্জাবে জনবিনিময় হয়েছিল সেজন্য উদ্বাস্তুরা একবারেই সবাই চলে এসেছিলেন। তাছাড়া মুসলমানরা চলে যাওয়ায় ভারতের পাঞ্জাবে অতিরিক্ত(জনসংখ্যার সমস্যা ভোগ করতে হয় নি। তাঁদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের পরিমাণ ছিল তুলনামূলক অনেক বেশী ও পুনর্বাসন পরিকল্পনাও হয়েছিল অনেক ভাল। জওহরলাল নেহে(নেহে(-লিয়াকত চুক্তি(করে জানিয়ে দিলেন যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দুরা উদ্বাস্তু নন কারণ এঁরা আবার ফিরে যাবেন। এটাই দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারে মনোভাব ছিল ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। পশ্চিবঙ্গের কংগ্রেস সরকার এর বিরোধিতা করে নি। উদ্বাস্তুদের ত্রাণ পুনর্বাসন নিয়ে চলে চরম অবহেলা, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটান উদ্বাস্তুরা। উদ্বাস্তুদের স্থাপন করা কলোনিগুলি বেআইনি হয়ে থাকে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আন্দোলন প্রাথমিকভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা কংগ্রেসী নেতাদের নেতৃত্বে থাকলেও কয়েক বছরের মধ্যে তা চলে যায় বামপন্থী নেতাদের হাতে। কমুনিষ্ট নেতৃত্ব উদ্বাস্তুদের আন্দোলনকে জঙ্গী করে তোলেন, পরবর্তীকালে এই শক্তি(ই পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের ভোটের ময়দানে বড় শক্তি(হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই বামপন্থী নেতৃত্বের আন্দোলন সবচেয়ে বড় সর্বনাশটি করে যে উদ্বাস্তু হবার পিছনের মূল কারণটিকে তাঁরা একেবারেই অদৃশ্য করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানরা উদ্বাস্তু হচ্ছেন না, বরং মুসলমান উদ্বাস্তুরা ফিরে এসেছেন অথচ পূর্বপাকিস্তান থেকে হিন্দুদের ত্র(মাগত বিতাড়ন চলছেই—এই সত্যটিকে তাঁরা আড়াল করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জয়গান গেয়েছেন। ফলে তাঁদের (-াগান হিন্দু উদ্বাস্তুরা দেশভাগের বলি—এই মিথ্যাটি স্বীকৃতি পেয়েছে। আসলে হিন্দু উদ্বাস্তুরা ইসলামি সমাজের বলি—এই সত্যটাকে ভুলিয়ে দিয়ে উদ্বাস্তু আন্দোলন ও পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘস্থায়ী (তি করেছে বামপন্থীরা।

পশ্চিমবঙ্গ একটি জনঘন প্রদেশ। তার ঘাড়ে এই বিপুল অতিরিক্ত(জনসংখ্যা যে পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ অসুবিধার কারণ হবে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, মধ্যপ্রদেশের দন্ডকারণ্যে, মহারাষ্ট্রের ঘাটচৌলি, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশে নৈনিতাল—ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে পুনর্বাসনের

উদ্যোগ নেন। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে, বামপন্থী উদ্বাস্তু আন্দোলনের বিরোধিতায়, স্থানীয় রাজ্য সরকারগুলির উদাসীনতায় এই পরিকল্পনাগুলি অনেকটাই ব্যর্থ হয়। কিন্তু ব্যর্থতা সত্বেও এই স্থানগুলিতে অনেক উদ্বাস্তু বসবাস করেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার ও পরবর্তী বামফ্রন্ট সরকার এই বাঙালি উদ্বাস্তুদের কোন খোঁজখবর রাখে নি। এই উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সমস্যা যেমন জমির মালিকানা, নাগরিক পরিচিতি, বাংলা ভাষা শেখার সুবিধা—ইত্যাদির এখানো সমাধান হয় নি। বরং ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্টের একটি শরিক দলের প্ররোচনায় অনেক উদ্বাস্তু সুন্দরবনের কয়েকটি দ্বীপে এসে বসবাস শু(করেন যার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান দ্বীপটি ছিল মরিচঝাপি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই উদ্বাস্তুদের পুলিশি আত্র(মণ করে দ্বীপ থেকে উৎখাত করে। এই আত্র(মণে অনেক উদ্বাস্তু পুলিশের গুলিতে, জলে ডুবে নিহত হন—সংখ্যাটা শতাধিকের উপরে বলেই অনুমান করা হয়। উদ্বাস্তুদের উপর কমুনিস্ট সরকারের এরকম মর্মান্তিক আত্র(মণ তাদের উদ্বাস্তু দরদের মুখোশ খুলে দেয়।

বাংলাদেশ—হিন্দু উদ্বাস্তুরা ইসলামি সমাজের বলি

১৯৭০ সালে দীর্ঘদিন পর পাকিস্তানে সামরিক শাসন শেষ করে নির্বাচিত সরকারের শাসনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সাধারণ নির্বাচন হলো। এই নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লীগ পাকিস্তানের সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রায় সব আসনেই বিজয়ী হলো। এই ফলাফলের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ও শাসক দল আওয়ামি লীগের হবার কথা। কিন্তু পাকিস্তানের আসল (মতাবান সৈন্যবাহিনীর কর্তারা ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দল ভুট্টোর পিপলস পার্টি তা মেনে নিতে পারল না। এই সংঘাতের ফলে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ডাক দিলেন। এরপরই পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করে নামিয়ে আনা হল ভয়ংকর নির্যাতন। সামরিক বাহিনী যে হত্যালীলা চালালো তাতে কয়েক ল(মানুষ খুন হলেন। এই খুন হওয়া মানুষদের ৯০ শতাংশ হিন্দু। এই যুদ্ধের সময়ে ১ কোটির বেশী উদ্বাস্তু ভারতে সাময়িক আশ্রয় নেয় যাদের প্রায় ৯৫ শতাংশ হিন্দু। ১৯৭১-এর শেষে ভারত আত্র(ান্ত হলে ভারত বাংলাদেশের মুক্তি(যুদ্ধের প(যুদ্ধ শু(করে। এর ফলে দ্রুত পাকিস্তান পরাজিত হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হয়। এই দ্রুত জয়ের জন্য ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সহস্রাধিক সেনা প্রাণ দেন। প্রকৃতপ(হিন্দুদের বলিদানের উপর রচিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর শেখ মুজিবর রহমান দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে একটি প্রকৃত ধর্মনিরপে(সংবিধান প্রণয়ন করেন। কিন্তু তিন বছরের মধ্যেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি ও তাঁর পরিবারের প্রায় সবাই এক সামরিক অভ্যুত্থানে খুন হয়ে যান। বাংলাদেশ হবার পর এই সময়টিতেই হিন্দুরা কিছুটা আশা ফিরে পেয়েছিলেন। এরপর বাংলাদেশে (মতায় আসেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি একটি রাজনৈতিক দল তৈরী করেন যার নাম বিএনপি (বাংলাদেশ ন্যাশানলিস্ট পার্টি)। তিনি সংবিধানের ধর্মনিরপে(অংশ বাদ দিয়ে একটি নতুন ধারা জুড়ে দেন যাতে বলা হয় সর্বশক্তি(মান আল্লার উপর পরম বি(াস ও আস্থাই হবে সমস্ত কাজের ভিত্তি। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিসমিল্লাহির রহামানির রহিম যুক্ত(করা হল। ১৯৮১ সালে জেনারেল জিয়া খুন হলে ১৯৮২ সালে হুসেন মহম্মদ এরসাদ সামরিক (মতা দখল করলেন। ১৯৮৮ সালে জেনারেল এরসাদ সংবিধানে একটি নতুন ধারা যুক্ত(করেন। এতে ঘোষণা হল যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এর ফলে ১৯৮৮ থেকে অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা (হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান) দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হলেন।

সুতরাং বাংলাদেশ গঠিত হলো, হিন্দুরা তার সহায়ক শক্তি(ই ছিল। ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে মূল ভূমিকা পালন করলো। এখন আর দেশভাগের কোন ব্যাপার নেই, ভারত কোন শত্রু দেশ নয়। সুতরাং আবার হিন্দুরা উদ্বাস্তু হবার কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু উপরে বলা ঘটনাগুলি বুঝিয়ে দেয় যে বাংলাদেশের ইসলামি সমাজ পাকিস্তানি মানসিকতাতেই রয়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশ দিনে দিনে একটি ইসলামি দেশেই পরিণত হয়েছে। আগের মতই হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছেন, হিন্দু নারীরা ধর্ষিতা হচ্ছেন, পূজার সময় মূর্তি ভাঙা চলছে। আওয়ামি লীগ (মতায় এলে তা কিছুটা কমে এই যা। ১৯৯০ সালে বাবরি সৌধ আত্র(ান্ত হওয়ার পর সারা বাংলাদেশ জুড়ে আত্র(মণ হয়। বাঙ্গালী মুসলমানেরা মন্দির ধ্বংস করেই (ান্ত থাকেনি, হিন্দুদের দোকান-বাড়ী-ঘর লুঠ করা, এমনকি ঢাকার বিখ্যাত ঢাকে(শ্বরী মন্দির এবং চট্টগ্রামের কৈবল্যধাম ভাঙচুর ও তছনছ করে। ১৯৯২-এ বাবরি সৌধ ভাঙার পর যে ভয়ঙ্কর তান্ডব চলে তাতে ২৮,০০০ বাড়ি-ঘর, ৩,৬০০ মন্দির, ২,৫০০ দোকান-বাজার ধ্বংস হয়। খুন হন ১৩ জন। ২০০১-এর অক্টোবর বি.এন.পি- জামাত জোট (মতায় আসার পর হিন্দুদের ওপর নৃশংস অত্যাচার শু(হয়। কয়েক ল(লোক প্রাণ বাঁচাতে ভারতে পালিয়ে আসেন। দিনের পর দিন শয়ে শয়ে হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়। পরবর্তী তিন বছর ধরে চলে হিন্দুদের ওপর বর্বর অত্যাচার। এ নিয়ে বিখ্যাত

মানবাধিকার কর্মী শাহরীয়ার কবিরের সম্পাদনায় তিন খন্ডে করা রির্পোট প্রকাশ করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি।

এই অবস্থায় বাংলাদেশ থেকেও হিন্দু উদ্বাস্তুরা আসছেন গত ৪০ বছর ধরেই। পুরানো উদ্বাস্তু সমস্যা অর্থাৎ পাকিস্তান আমলের উদ্বাস্তু সমস্যা কিছু রয়ে গেছে তার সঙ্গে যুক্ত(হয়েছে এই নতুন বিপুল উদ্বাস্তু সমস্যা। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে একের পর এক হিন্দু পুরোহিত সন্ন্যাসীদের হত্যা করা হয়েছে। গত সত্তর বছরে পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ২৮ শতাংশ থেকে কমে ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক বরকত তাঁর বইয়ে হিসাব করে বলেছেন যে ১৯৭১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে ৬৩ ল(হিন্দু বাংলাদেশ থেকে উধাও হয়ে গেছেন। এই নতুন উদ্বাস্তুদের সমস্যার ধরণ ১৯৭১-এর আগের উদ্বাস্তুদের থেকে একেবারেই ভিন্ন। এরপর আমরা সে আলোচনায় আসবো।

অনুপ্রবেশ ও জ্যোতি বসু

জওহরলাল নেহে(নেহে(-লিয়াকত চুক্তি(করে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে এনে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশের ভিত্তিটি পাকাপোক্ত(করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন সিপিআইএমের জ্যোতি বসু। এতদিনে বাংলাদেশ হয়ে গেছে, ফলে নেহে(-লিয়াকত চুক্তি(বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং জ্যোতি বাবুর সরকার বেআইনিভাবে বাংলাদেশের মুসলমানদের পশ্চিমবঙ্গে আসার ঢালাও ব্যবস্থা করে দিলেন। এর ফলাফল দেখা যাবে ১৯৮১ থেকে জনগণনায়। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ১৯.৮৫ %। ১৯৮১ সালে এটা হয়েছে ২১.৫১ %। অর্থাৎ ত্রিশ বছরে জনসংখ্যায় অনুপাত বেড়েছে ১.৬৬ %। আর ১৯৮১ থেকে ২০১১ এই ত্রিশ বছরে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বাড়লো তিনগুণ—একেবার ৫.৫% । অনুপ্রবেশের ভয়াবহ চিত্র জ্যোতি বসু নিজেই সি পি এমের এম-এর মুখপত্র '**গণশক্তি**('র ১১ই অক্টোবর, ১৯৯২ সংখ্যায় লিখেছেন-১৯৭১ থেকে মুসলমানরাও ভারতে আসতে শু(করলো। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বি এস এফ ২,৩৫,৫২৯ জন বাংলাদেশীকে সনাক্ত(করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৮,৪৭২ জন হিন্দু আর ১,৬৪,১৩২ জন মুসলমান। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত মোবাইল টাস্ক ফোর্স ২,১৬,৯৮৫ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এদের মধ্যে ৫৬,৩৪২ জন হিন্দু ও ১,৬৯,৭৯৫জন মুসলমান। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকারী ভাষ্যেই ১৫ বছরে সাড়ে চার ল(বাংলাদেশীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যার প্রায় ৭৫ শতাংশ মুসলমান। সুতরাং এটা বোঝা কষ্টকর নয় যে এই তাড়িয়ে দেবার

অন্তত দশগুণ লোক ঢুকে গেছে অন্যপথে। ভারতের প্রথম কমুনিস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ৬মে, ১৯৯০-এর লোকসভায় জানান যে ভারতে বেআইনী বাংলাদেশীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। এই তথ্য দেওয়ার জন্য দুজন সাংসদ প্রবল আপত্তি তোলেন—একজন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী (নিজে উদ্বাস্তু) ও মুসলিম লীগের বানাতওয়ালা। অনুপ্রবেশ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল এইজন্য যে পরে আমরা দেখবো একদল নেতা এই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের উদ্বাস্তু ও ভারতীয় নাগরিক বানানোর জন্য যথেষ্ট হৈ হল্লা ও প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

দলিত-মুসলিম ঐক্য ও উদ্বাস্তু আন্দোলন

ভারতে নতুন যে বিপদের শু(হয়েছে তা হল দলিত-মুসলিম ঐক্যের প্রচার। এর মূল কথা হিন্দু তফশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ ও মুসলমানদের মূল শত্রু হচ্ছে বর্ণহিন্দুরা। তফশিলি আন্দোলনের মহাপু(ষ ও ভারতে সংবিধানের অন্যতম স্রষ্টা বাবাসাহেব আম্বেদকার তাঁর লেখায় বারবার ভারতে ইসলামি শাসনের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং সাম্প্রদায়িকতার সমাধানে হিন্দু-মুসলমান জনবিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। সুতরাং দলিত-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্ত(ারা আম্বেদকারের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামি রাষ্ট্রে ও সমাজে যে তফসিলি হিন্দুরাও থাকতে পারবেন না সে কথা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ১৯৫০ সালেই বলে গেছেন পাকিস্তানপন্থী তফসিলি সম্প্রদায়ের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। বিষয়টি আগেই আলোচিত হয়েছে। ১৯৭২ থেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, যত মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন তার ৯০ শতাংশই তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষ। আশ্চর্য ! বাংলাদেশে তফসিলি সম্প্রদায়ের উপর এই অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ পশ্চিমবঙ্গের দলিত-মুসলিম ঐক্যের তফসিলি সংগঠনের নেতারা করেন না। দলিত-মুসলিম ঐক্যের একটি উদ্বাস্তু সংগঠন জয়েন্ট এ্যাকশন কমিটি ফর বাঙালি রিফিউজিস প্রকাশিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০০৩ নামক একটি পুস্তিকায় লেখা হচ্ছে—'এক কথায় বলা যায় ভারত সরকারের মতই পাকিস্তান সরকারও নিজের দেশের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার র(ার প্রতি মনোযোগ দেয়, এমনকি কোন কোন (ে ত্রে পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারকে পিছনে ফেলে দেয় (পৃঃ ৪)'। ইসলামি সমাজের অত্যাচারে পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসে যারা এখানে পাকিস্তানের গুণগান গায় তারা শুধু বাস্তুহারা উদ্বাস্তুদের শত্রু নয়, এরা সামগ্রিকভাবে দেশের শত্রু।

এ বিষয়ে সাম্প্রতিক কালে মতুয়া সমাজের কথা পত্র পত্রিকায় আলোচিত হচ্ছে। তফসিলি সমাজের একটি বড় জনগোষ্ঠী এই ধর্মীয় সংঘের সঙ্গে যুক্ত(। মতুয়া সম্প্রদায়ের

শিষ্যরা পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সমাজের মানুষ। এই সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় ওড়াকান্দি গ্রামে। দেশভাগের সময় মতুয়া সম্প্রদায়ের গু(শ্রীপ্রমথরঞ্জন ঠাকুর ছিলেন বাংলার আইনসভার নির্বাচিত সদস্য। দেশভাগের সময় তিনি পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে চলে আসেন ও ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর মাসে বনগাঁর কাছে জমি কিনে নতুন মতুয়াকেন্দ্র গড়ে তোলেন যার নাম এখন ঠাকুরনগর। দেশ ছাড়ার আগে তিনি শেষ জনসভা করেন নড়াইলের জমিদার বাড়ীর প্রাঙ্গণে। সেখানে মতুয়া ভক্ত(বৃন্দদের বলেন —কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মাউন্টব্যাটনের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় দেশ খন্ডিত হবার পথে এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে আবার আমাদের দাঙ্গার সম্মুখীন হতে হবে। ভবিষ্যতে আমাদের বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এখন আমাদের কী করণীয়? নিঃসন্দেহে আমরা বিশাল হিন্দু সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সংকটময় মুহূর্তে তফসিলিদের নিজেদের স্বার্থে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু সমাজের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মূল কান্ড থেকে কোন শাখাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে সেটি অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। স্বধর্মের কোটি কোটি হিন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে লীগের বন্ধুত্ব অচিরেই তফসিলি জাতির বিপদ ডেকে আনবে। আপাত উন্নতির মোহে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মিঃ জিন্নাহর মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন পরিণামে অপরিসীম (তি ডেকে আনবে। কিছুদিনের মধ্যে দেশভাগ হয়ে যাবে। দেশভাগের ফলে আমাদের জন্মভূমি যদি পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে, আমরা যেন সকলে এক থাকি। ফেডারেশন ও লীগের কথায় না ভুলি। ভারতভূমিতে আমরা যেন সকলে এক সাথে চলে যেতে পারি। আমার অনুপস্থিতিতে আপনারা যেন সংঘবদ্ধ থাকেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করেন যা আমি আগেই আপনাদের বলেছি (মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, সদানন্দ বি(াস, পৃঃ ১৬০-১৬১, দীপালি বুক হাউস, কলকাতা ২০০৪)। যে সমাজের সর্বোচ্চ নেতাকে দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয় ও যিনি পরিস্কারভাবে তাঁর ভক্ত(দের প্রতি তার বক্ত(ব্য রেখে গেছেন—আজ সেই সমাজের কিছু নেতা বাংলাদেশের ইসলামি অত্যাচার নিয়ে ন্যুনতম কথাও বলেন না, বরং সভা করে দলিত মুসলিম ঐক্যের প্রচার চালান।

এইসব দলিত-মুসলিম উদ্বাস্তু সংগঠনের বাইরেই উদ্বাস্তু আন্দোলনের মূল শক্তি(কাজ করে চলেছে। এদের মধ্যে রয়েছে উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ মাইরিটি ফোরাম, বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদ, অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্ট ও অন্যান্যরা। তারা সঠিক ভাবেই উদ্বাস্তুদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে আন্দোলনের সঙ্গে দলিত মুসলিম ঐক্যের বিপদকে চিহ্নি(ত করে ও অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের দাবীকেও তুলে ধরে।

উদ্বাস্তু ও নাগরিকত্ব

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসা হিন্দুরা (বা বৌদ্ধ ও খ্রীস্টানরা) ভারতে প্রবেশ করার সময় একটি রসিদ পেতেন। এই রসিদ ছিল তাঁদের উদ্বাস্তু হবার পরিচয় এবং পরবর্তীকালে তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হত। যাঁদের এই রসিদ ছিল না তাঁরা পরে আদালতে এফিডেভিট করে তাঁদের আসার স্বীকৃতি পেয়ে যেতেন। এরপর তাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্বের স্বীকারও পেয়ে যান। নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-র ৫.১(ক) ধারা অনুযায়ী ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্যক্তি(রা যেমন পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুরা সাধারণ ভাবেই ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়েছেন। কিছু উদ্বাস্তুর, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অবস্থিত কিছু উদ্বাস্তুর এখনও এই নাগরিকত্ব সংক্র(ান্ত সমস্যা রয়ে গেছে। পূর্বপাকিস্তান থেকে চলে আসা হিন্দুরা উদ্বাস্তু বলেই পরিচিত ছিলেন।

কিন্তু বাংলাদেশ গঠিত হবার সংগ্রামের মাঝখানেই ২৯ নভেম্বর১৯৭১, ভারত সরকার সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের একটি এক্সপ্রেস লেটার (Express Letter No. 26011/16/71-10) পাঠায়। এর বিষয় ২৫মার্চ ১৯৭১ এর পর যে সব উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাদের নাগরিকত্ব প্রদান প্রসঙ্গে। চিঠিতে বলা হয় যে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য এই সব উদ্বাস্তুদের আবেদন গ্রহণ করা হবে না। এর কারণ ছিল তখন বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুর সংখ্যা কোটিতে পৌঁছেছে যাঁদের প্রায় সবাই পরে ফিরে যান। এরপর বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপ(সংবিধান গ্রহণ করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো।

১৯৭২ সালে ইন্দিরা-মুজির চুক্তি(হয় দুটি স্বাধীন দেশের মধ্যে যাতে একে অপরকে একটি সহযোগী রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করে। সুতরাং পাকিস্তান পর্ব শেষ, পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আসার আর কোন কারণ থাকল না। কিন্তু ঘটনা যে অন্যরকম, ইসলামি সমাজে অন্য ধর্মের মানুষেরা বারবার আক্র(ান্ত হন যে বিষয়টি আগেই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং আবার উদ্বাস্তু আসা শু(হলো, পাকিস্তান আমলের মতই। কিন্তু সমস্যা হলো ১৯৭২ থেকে যে সব হিন্দু উদ্বাস্তুরা আসতে থাকলেন আগের মত তাঁদের জন্য কোন আইনী র(ার ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং যাঁরা বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ভারতে আসছেন বা যাদের ভিসা ফুরিয়ে যাচ্ছে আইনের চোখে তারা অবৈধ হয়ে যাচ্ছেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এই নতুন উদ্বাস্তুদের একটি প্রধান

পার্থক্য হলো যে এই উদ্বাস্তুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া সম্ভব হলো না। ইতিমধ্যে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন কয়েকবার সংশোধন করে আরো কঠোর হয়েছে। জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের সুবিধা বাতিল করা হয়েছে। ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন উদ্বাস্তুদের নাগরিক হবার পথে আরো বাধা সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গে অনেক উদ্বাস্তুকে কারাবাস থেকে শু(করে পুলিশী হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক গরীব মানুষ সরাসরি পুনর্বাসন বা অনুদান পান না, কারণ আইনতঃ তাঁদের অস্তিত্বই ছিল অবৈধ। যদিও অনেক উদ্বাস্তুই এখানে রেশন কার্ড করিয়েছেন, ভোটার লিস্টে নাম তুলেছেন, আধার কার্ড করেছেন-তবু যে কোন সময় তাঁদের এই পরিচয়পত্রগুলি পরী(া করলে বাতিল হয়ে যেতে পারে। ফলে গত দু দশক ধরে উদ্বাস্তু আন্দোলনের মুখ্য দাবীই ছিল বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদান।

বিজেপি কি করছে

গত কয়েক দশক ধরে উদ্বাস্তু সংগঠনগুলি নাগরিকত্বের দাবী রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে বারবার করে এসেছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোন প্রধান রাজনৈতিক দল সিপিআইএম, তৃণমূল ও কংগ্রেস উদ্বাস্তুদের এই স্বীকৃতির জন্য কোন প্রচেষ্টা নেয় নি। গত ৪৫ বছর ধরে কেন্দ্রে মূলতঃ রাজত্ব করেছ কংগ্রেস দল। তারা এই বিষয়টি নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় নি। বিশেষতঃ গত দুদশক কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি অংশ ইসলামি মৌলবাদকে তোষণের কাজটি আরো জোরদার করেছে। উদ্বাস্তু নাগরিকত্বের সমস্যাটি মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গের (এবং কিছুটা আসামের যে আলোচনায় আমার যাচ্ছি না)। পশ্চিমবঙ্গে গত ৪০ বছরের ৩৪ বছর শাসন করেছে বামফ্রন্ট এবং ৬ বছর তৃণমূল সরকার। এরা কেউ এই উদ্বাস্তু নাগরিকত্বের সমস্যাটি নিয়ে কোন কথাই বলে নি। নাগরিকত্ব বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব সংসদের কিন্তু সংসদে পশ্চিবঙ্গের বামফ্রন্ট, তৃণমূল ও কংগ্রেস সাংসদদের কখনোই কথা বলতে দেখা যায় নি। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল সিপিআইএম, তৃণমূল ও কংগ্রেস বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের স্বার্থে কোন কাজ করে নি। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠন, শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক, সংবাদ দপ্তর ও টিভি বা কলেজ বি(বিদ্যালয়ের গবেষণা-কোন মহল এই বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন নি। এদের সবার নীরবতার একটাই কারণ যে উদ্বাস্তু নিয়ে আলোচনা হলেই বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদের দাপটের খবর সবাই জেনে যাবে, মেকী ধর্মনিরপ(তার আড়াল আর কাজ করবেনা। যদিও বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ও বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ, লেখক, মানবাধিকার সংগঠন এই নিয়ে যথেষ্ট সরব।

বিজেপি কি করছে? বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যের সদর্থক উদ্বাস্তু আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে, তাঁদের নেতা কর্মীরা এইসব আন্দোলনে প্রত্য(অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১৪ সালের বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল যে হিন্দু উদ্বাস্তুদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ভারত এবং তিনি (মতায় এসে সেই ব্যবস্থা করবেন। নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর কথা রেখেছেন। গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৫তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার পাসপোর্ট আইন, ১৯২০ ও বিদেশি আইন ১৯৪৬এর সংশোধন করেছে। এতে বলা হয়েছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের যাঁরা ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে বা তার আশঙ্কায় দেশ ত্যাগ করে ভারতে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের জন্য এই আইন সংশোধন হয়েছে। এই সংশোধনের ফলে বাংলাদেশে ও পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে চলে আসা এই দেশগুলির সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, পার্সি সম্প্রদায়ের মানুষেরা যাঁরা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ভারতে চলে এসেছেন তাঁরা ভারতে আইনী বসবাসের অধিকারী হলেন। অর্থাৎ গত ৪৫ বছর ধরে উদ্বাস্তুরা সব সময়েই যে বেআইনী বসবাসের ভয়ে শংকিত থাকছিলেন, বিভিন্ন সময়ে এই কারণে তাঁদের পুলিশি হয়রানি থেকে কারাবাস পর্যন্ত হয়েছে—এইসব থেকে আইনী মুক্তি(র ব্যবস্থা করল নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার। উদ্বাস্তু আন্দোলন এজন্য তাঁকে বিপুল ধন্যবাদ জানিয়েছে।

নাগরিকত্ব বিল ও কারা বাধা দিচ্ছে

বসবাসের স্বীকৃতির পরের ধাপ হচ্ছে ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়া। ১৯শে জুলাই ২০১৬তে লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬, পেশ করেন। এই সং(প্ত বিলটিতে বলা হয়েছে যে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের যাঁদের পাসপোর্ট আইন, ১৯২০ ও বিদেশি আইন ১৯৪৬-এ থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাঁদের আর অবৈধ অধিবাসী বলে গণ্য করা হবে না। সংখ্যালঘু বলতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন ও পার্সিদের উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে তাঁরা ভারতীয় নাগরিক হবার জন্য যোগ্য হলেন। এছাড়া নাগরিকত্বের আবেদনের জন্য তাঁদের ৬ বছর ভারতে থাকতে হবে যা অন্যান্যদের জন্য ১১ বছর।

এরপরই শু(হলো মুসলিম তোষণবাদীদের খেলা। এই আইনটি পাস হয়ে গেলে হিন্দু উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন কিন্তু বাংলাদেশে থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা মুসলমান

অনুপ্রবেশকারীরা এই অধিকার পাবে না। বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গে থেকে বিতাড়নের কোন আইনী জটিলতা থাকবে না। ফলে বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের জন্য মাঠে নেমে পড়লেন সেকুলার নেতারা। বিলটি লোকসভায় পেশ করা হলে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি প্রধান দল তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআইএম ও কংগ্রেস-এর বিরোধিতা করলো। এঁদের বিলের বিরোধিতার কারণ একটাই-কেন এই বিল থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়া হল। এঁদের সবার মূল কথা—এই বিল সংবিধান বিরোধী। এটি সংবিধানের ১৪নং মৌলিক অধিকারকে খর্বিত করে। ধর্মের ভিত্তিতে এই বিভাজন সম্ভব নয়। এই অভিযোগগুলির জবাব—

অভিযোগ ১ ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন - এই আইনটি করা হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা অনুযায়ী। আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তিনটি দেশেরই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং সেখানে ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের যাঁরা ইতিমধ্যেই ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে। কেউ কেউ এই বিল শুধু হিন্দুদের জন্য বলেছেন, এটিও মিথ্যা কারণ এতে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পার্শি সবার কথাই বলা আছে। ১৯৫১-এর রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশনে যা ১৯৬৭-র প্রোটোকলে সংশোধিত হয় তাতে উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে- যে ব্যক্তি(র জাতি, ধর্ম, নাগরিকত্ব বা কোন সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্থার সভ্য হবার জন্য নিপীড়িত হবার যথেষ্ট উপযুক্ত(আশংকা রয়েছে বলে তাঁর নাগরিকত্ব যে দেশের তার বাইরের দেশে রয়েছেন, অথবা এই ভীতির জন্য তাঁর দেশের নিরাপত্তা নিতে আগ্রহী নন, অথবা এই সব কারণে নিজের দেশের বাইরে রয়েছেন এবং ফিরতে পারছেন না বা এই ভীতির জন্য ফিরতে ইচ্ছুক নন। মনে রাখতে হবে যে অর্থনৈতিক কারণে চলে আসা কাউকে রাষ্ট্রসংঘের সংজ্ঞায় উদ্বাস্তু গণ্য করা যায় না। সুতরাং ভারত সরকার যাঁদের নাগরিকত্ব দিচ্ছেন তাঁরা আর্ন্তজাতিক আইনেই স্বীকৃত উদ্বাস্তু। এই সংজ্ঞার বাইরে অন্যান্য কেউ ভারতে ঢুকলে তারা অনুপ্রবেশকারী যাদের দেশ থেকে বিতাড়ন করা আইনি ও জাতীয় কর্তব্য।

অভিযোগ-২ আইনটি সংবিধানের ১৪ নং ধারা লঙঘন করছে। ফলে তা সংসদে পাশ হবে না। না, আদৌ লঙঘন করছে না। সংবিধানের ১৪ নং ধারা বলে যে রাষ্ট্র সব নাগরিককে আইনের সামনে সমান বিবেচনা করবে এবং সমান সুর(া প্রদান করবে। এর মানে এই নয় যে বিশেষ (ে ত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। তাহলে সরকার সংখ্যালঘু, তফশিলি জাতি, উপজাতি, নারী, প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বিশেষ আইন ও সুবিধার ব্যবস্থা করতেই পারত না। আর্ন্তজাতিক আইনে মান্য উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও নাগরিকত্ব দেওয়া কখনোই সংবিধানের ১৪ নং ধারা লঙঘন করে না।

সুতরাং সিপিআইএম, কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতায় লোকসভায় এই আইন তখন পাস হলো না। সত্যিকারের উদ্বাস্তু স্বার্থে যাঁরা আন্দোলন করেন তাদের উচিত এই তিনটি দলের বি(দ্ধে উদ্বাস্তুদের সচেতন করা ও এদের ইসলামি তোষণবাদী রূপকে চিনিয়ে দেওয়া। যাদের অত্যাচারে উদ্বাস্তু হয়ে মানুষেরা পালিয়ে এলো সেই ল(ল(বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের র(া করাই এই তিনটি দলের মূল উদ্দেশ্য। এজন্যই এই বিলটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ এবং পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নির্ধারণ করবে।

এখন বিলটি একটি যৌথ সংসদীয় কমিটিতে বিবেচনার জন্য রয়েছে। এই কমিটিতে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন (তৃণমূল), প্রদীপ ভট্টাচার্য (কংগ্রেস) এবং মহঃ সেলিম (সিপিআইএম)। এঁরা সবাই এই বিলের বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং সংসদীয় পদ্ধতি মেনে লোকসভা ও রাজ্যসভায় আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সুনিশ্চিত করে বিজেপি এই বিলকে আইনে রূপায়িত করার দিকে এগোচ্ছে। উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদান, তাঁদের পুর্নবাসন ও উন্নয়ন একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিই করতে পারে। বিজেপি সেই ল(্যই এগিয়ে চলেছে।

Bill No. 172 of 2016

THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016

A BILL Further to amend the Citizenship Act, 1955.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1.(1) This Act may be called the Citizenship (Amendment) Act, 2016

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In the Citizenship Act, 1955 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, in sub-section (1) after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that persons belonging to minority communities, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis the Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, who have been exampled by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India), Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any order made thereunder, shall not be treated as illegal migrants for the purposes of this Act.

3. In the principal Act, in section 7D, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely : (do) the Overseas Citizen of India Card holder has violated any of the provisions of this Act or provisions of any other law for the time being in force, or"

4. In the principal Act, in the Third Schedule, in clause(d), the following proviso shall be inserted, namely :- Provided that for the persons belonging to minority communities, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians for Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, the aggregate period of residence or service of Government in India as required under this clause shall be read as "not less than six years" in place of "not less than eleven years".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Citizenship Act, 1955 was enacted to provide for the acquisition and determination of Indian citizenship.

Under the existing provisions of the Act, persons belonging to the minority communities, such as Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, who have higher entered to India without valid travel documents or the validity of their documents have expired are regarded as illegal migrants and hence ineligible to apply for Indian citizenship. It is proposed to make them eligible for applying for Indian citizenship.

Many persons of Indian origin including persons belonging to the aforesaid minority communities from the aforesaid counties have been applying for citizenship under section 5 of the Act, but are unable to produce proof of their Indian origin. Hence, they are forced to apply for citizenship by naturalisation under section 6 of the Act, which, inter alia, prescribes twelve years residency as qualification for naturalisation in terms of the Third Schedule to the Act. This denies them many opportunities and advantages that many acquire only to the citizens of India, even though they are likely to stay in India permanently. It is proposed to amend the Third Schedule to the Act to make applicants belonging to minority communities from the aforesaid countries eligible for citizenship by naturalisation in seven years instead of the existing twelve years.

Presently, there is no specific provision in section 7D of the Act to cancel the registration of Overseas Citizen of India Card holders who violate any Indian law. It is also proposed to amend the said section 7D, so as to empower the Central Government to cancel registration as Overseas Citizen of India in case of violation of the provisions of the Act or any other law for the time being in force.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

RAJNATH SINGH

NEW DELHI

THE 15TH JULY, 2016

LOKSABHA

Minister of Home Affairs

GMGIPMRND-1537LS(S-3)-15.07.2016

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II - SEC.3(i)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2015

G.S.R. 685(E) - In exercise of the powers conferred by section 3 of the **Passport (Entry into India) Act, 1920,** the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport (Entry Into India) 1950, namely

1.(1) These rules may be called the Passport (Entry into India) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passport (Entry into India) Rules, 1950 in rule 4, in sub-rule (1) after clause (h) the following clause shall be inserted, namely :-

"These rules may be called the Passport (Entry Into India) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Passport (Entry into India) Rules, 1950, in rule 4 in Sub-rule (1) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely :-

(ha) persons belonging to minority communities in Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who were compelled to seek shelter in India due to religious persecutory or fear of religions persecution and entered into India on or before the 31st December, 2014.

(i) Without valid documents including passport or other travel documents, or

(ii) With valid documents including passport or other travel

documents and the validity of any of such documents has expire. Provided that provision of this clause shall take effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette."
[F. No. 25022/50/2015-F.I]
G.K. DWIVEDI, Jt. Secy.
Note : The principal rules were published vide number 4/549-F.I, dated the 25th April, 1950 and last amended vide number GSR 132(E) dated the 26th February, 1992.

ORDER
New Delhi, the 7th September, 2015
G.S.R. 686 (E)- In exercise of the powers conferred by section 3 of the **Foreigners Act, 1946 (31 of 1946)**, the Central Government hereby makes the following order further to amend of Foreigners Order, 1948, namely :-
1. (1) These Offer may be called the Foreigners (Amendment) Order, 2015.
(2) It shall come into force on the date of tis publication in the Official Gazette.
In the Foreigners order, 1948, after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely :-
"3A, Exemption of certain class of foreigners. (1_Persons belonging to minority communities in Bangladesh and Pakistan, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who were compelled to seek shelter in India due to religious prosection or fear of religious persecution and entered into India on or before the 31st December, 2014.
(a) Without valid documents including passport of other travel documents and who have been exempted under rule 4 from the provisions of rule 3 of the Passport (Entry into India) Rules, 1950 made under section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920) or
b) With valid documents including passport or other travel document and the validity of any of such documents has expired.

Are hereby granted exemption from the application of provisions of the Foreigners Act, 1946 and the orders made thereunder in respect of their stay in India without such documents or after the expired of those documents, as the case many be, from the date of publication of this order in the Official Gazette.
[F. No. 25022/50/2015-I]
G. K. DWIVEDI, Jt. Secy.
Note. The principal Offer was published in the Gazette of India vide No. 9/9/46-Politcal (EW), dated the 14th February, 1948 and last amended vide number GSR 56(E) dated the 24th January, 2008.